বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণে এবং স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু সম্বলিত

the ULABian

শিক্ষার্থীদের মুখপাত্র

www.ulab.edu.bd/ulabian

সেপ্টেম্বর, ২০১৪ । আশ্বিন, ১৪২১ । জিলক্বদ ১৪৩৫

ধানমন্ডি, ঢাকা, বাংলাদেশ

এমএসজে আয়োজিত মিট দ্য এডিটর অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন দৈনিক প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান

ইউল্যাব শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রথম আলো সম্পাদক

এ এস এম রিয়াদ আরিফ

আগামী দিনের পৃথিবীতে কেমন হতে পারে মিডিয়ার হালচাল? বিশ কিংবা পঁচিশ বছর পরের বিশ্বে ছাপা কাগজ টিকে থাকবে তো? নাকি ডিজিটাল মিডিয়ার আধিপত্যে হারিয়েই যাবে? ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)-এর সাংবাদিকতা বিভাগের কৌতূহলী শিক্ষার্থীদের এমন অসংখ্য প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হলো প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানকে।

গত ৫ জুন ইউল্যাব অডিটোরিয়ামে "প্রিন্ট মিডিয়া ইন ডিজিটাল এইজ : প্রথম আলো এক্সপেরিয়েন্স" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিকতায় 'র‍্যামন ম্যাগসেসাই' পুরস্কার বিজয়ী সম্পাদক মতিউর রহমান। প্রখ্যাত এ গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব নবীন শিক্ষার্থীদের শোনালেন তাঁর বর্ণাঢ্য সাংবাদিকতা জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা আর বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকতার নানা চড়াই-উৎরাই ও সংগ্রামের গল্প।

দেশের সর্বাধিক পঠিত দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক এবং প্রকাশক তিনি। দীর্ঘ ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রথম আলোর পাঠকদের আস্থা আর ভালোবাসা অর্জনের গল্পটার প্রতি সবার আগ্রহ থাকাটাই স্বাভাবিক। সে আগ্রহেরই যেন বহিঃপ্রকাশ দেখা গেলো অডিটোরিয়াম ভর্তি শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের সামনে মতিউর রহমানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন প্রফেসর আসিউজ্জামান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাশ করা মতিউর রহমানের সাংবাদিকতা জীবনের শুরু হয় সাপ্তাহিক 'একতা' দিয়ে। ১৯৯২ সালে যোগ দেন দৈনিক ভোরের কাগজে। এরপর ১৯৯৮ থেকে এখন পর্যন্ত আছেন দৈনিক প্রথম আলোর সঙ্গে।

"যা কিছু ভালো, তার সাথে প্রথম আলো" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে তিনি প্রথম আলোকে নিয়ে গেছেন অন্য এক উচ্চতায়।

সেমিনারে মতিউর রহমান তার বক্তৃতায় তথ্যপ্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের এই যুগে প্রিন্ট মিডিয়ার ভবিষ্যৎ বিষয়ে বলেন, তরুণরা ইন্টারনেটের মাধ্যমেই সংবাদ পড়তে এবং সংগ্রহ করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এটি প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য একটা ধাক্কা হলেও এই দাবিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। ডিজিটাল যুগে দৈনিক পত্রিকাগুলোকে টিকে থাকতে হলে একাধিক আঞ্চলিক সংস্করণ বের করা প্রয়োজন বলেও তিনি মনে করেন।

সাংবাদিকদের সমাজের সবচেয়ে সচেতন ও সংবেদনশীল গোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করে তিনি মানুষকে নতুন করে জাগাতে ও পথ দেখাতে নবীন সাংবাদিকদের অগ্রণী ভূমিকা পালনের উপদেশ দেন। এক্ষেত্রে নিবিড় অধ্যয়ন এবং সঠিক চর্চার কোনো বিকল্প নেই বলে তিনি মনে করেন।

মতিউর রহমান বলেন, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ না জানলে ভালো সাংবাদিক হওয়া যায় না। প্রবীণ এ সম্পাদক বিশ্বাস করেন, সাংবাদিকদের সমাজ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সংবাদ পরিবেশন করা উচিত। ডিজিটাল যুগে অনলাইন পোর্টালগুলোর দ্রুত সংবাদ পরিবেশনার প্রতিযোগিতায় না গিয়ে ত্রুটিহীন ও নির্ভরযোগ্য সংবাদ পরিবেশনে মনোযোগী হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

আগামী দিনের মিডিয়ার রূপরেখার ব্যাপারে মতিউর রহমান শিক্ষার্থীদের একই নিউজরুম থেকে অনলাইন, প্রিন্ট ও টিভি সাংবাদিকতা পরিচালনা করার ধারণা দেন। তিনি মনে করেন, যুগের প্রয়োজনে গণযোগাযোগের সবগুলো মাধ্যমকে একীভূত করার সময় চলে এসেছে।

দীর্ঘ আলোচনা শেষে মতিউর রহমান শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। পরে ইউল্যাব মিডিয়া স্ট্যাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগের প্রধান প্রফেসর জুড উইলিয়াম হেনিলো প্রধান অতিথির হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, প্রফেসর ইমেরিটাস রফিকুল ইসলাম, ইউল্যাবের উপ-উপাচার্য প্রফেসর জহিরুল হক, প্রফেসর ব্রায়ান সুস্মিথ ও ইউল্যাব কমিউনিকেশন ও স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্সের উপদেষ্টা জুডিথা ওলমেখারসহ সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষকরা।

মতিউর রহমানের মতো ব্যক্তিত্বকে কাছে পেয়ে উল্লসিত ছিল ইউল্যাবের শিক্ষার্থীগণ। মতিউর রহমানও এমন আয়োজনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এই স্বপ্নাতুর তারুণ্যই একদিন বদলে দেবে বাংলাদেশ ও এর গণমাধ্যম, এমনই আশার কথা জানিয়েছেন মতিউর রহমান তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে।

ফিচার

মেঘ আর পাহাড়ের নগরে

দ্য ইউল্যাবিয়ান, পৃষ্ঠা ৮

সাক্ষাৎকার

আসাদ চৌধুরীর অন্দরমহল

দ্য ইউল্যাবিয়ান, পৃষ্ঠা ৯

ছবির গল্প

অরণ্য

দ্য ইউল্যাবিয়ান, পৃষ্ঠা ১২

ইউল্যাবে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ইএলটি সম্মেলন

জয়নব তাবাসসুম বানু

সম্মেলন শুরুর বেশ কিছুদিন আগে থেকেই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে শুরু হয় কাউন্টডাউন। ওদিকে স্বেচ্ছাসেবক টিমের নিরন্তর ব্যস্ততা আর প্রতীক্ষার প্রহর গোনা। অবশেষে ৮ আগস্ট সকালবেলা ঘড়ির কাঁটায় ১০টা ছুঁই ছুঁই, ইউল্যাব-এর অডিটোরিয়াম মঞ্চে এলেন কনফারেন্স কনভেনর এ টি এম সাজেদুল হক। অডিটোরিয়াম ভর্তি ৭টি দেশের ২৯টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত খ্যাতনামা সব শিক্ষাবিদদের স্বাগত জানালেন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ইএলটি (ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং) সম্মেলনে। ইউল্যাব-এর ইংলিশ এন্ড হিউম্যানিটিজ বিভাগ ও সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিজের যৌথ আয়োজনে "একুশ শতকের শ্রেণিকক্ষের রূপরেখা ঃ সমস্যা ও তার সমাধান" শীর্ষক দুই দিনব্যাপী এ আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ৮-৯ আগস্ট।

এতে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ইউল্যাব এর ইংলিশ ও হিউম্যানিটিজ বিভাগ ও সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিজের যৌথ উদ্যোগে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ইএলটি সম্মেলনের সফল আয়োজনের পর এক আনন্দঘন মুহূর্তে আয়োজকবৃন্দ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ড. জুড উইলিয়াম হেনিলো

উপদেষ্টা সম্পাদক
বিকাশ সিএইচ ভৌমিক

সম্পাদক
এ এস এম রিয়াদ আরিফ, এমএসজে

সহ-সম্পাদক
সানজিদা হক, এমএসজে
প্রমা সঞ্চিতা, এমএসজে

ইউল্যাবিয়ান দল
শুভ বসাক, বিবিএ
মনন মুনতাকা, এমএসজে
সামিউল ইসলাম শোভন, এমএসজে
আয়েশা খানম, এমএসজে
ফারিয়া মৌ, ইটিই
জয়নব তাবাসসুম, ডিইএইচ
সুরঞ্জিত বিশ্বাস, এমএসজে

সম্পাদকীয়

অবাধ্য তারুণ্য, মোটরসাইকেল ও মৃত্যুফাঁদ

এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে, বাংলাদেশে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েই চলেছে। প্রতিদিনই স্বজন হারানোর শোকে ভারি হচ্ছে বাতাস। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত বিশ বছরে সারা দেশে ৬৩ হাজারেরও অধিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ হাজারেরও বেশি। আহতদের কোনো সুনির্দিষ্ট হিসেব নেই। এসব দুর্ঘটনার বড় একটা অংশ দখল করেছে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, দুর্ঘটনার শিকার মোটরসাইকেল আরোহীদের অধিকাংশই বয়সে তরুণ। যাদের অনেকেই বিশ কিংবা বাইশ বছরের কোঠাই অতিক্রম করেনি। ফলে তাদের মৃত্যু মানে কেবল একটি প্রাণের অকালে ঝরে যাওয়াই নয়, বরং দেশ হারাচ্ছে তার এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ কর্ণধারকে। কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এ তরুণদের অনেকেই জীবন সম্পর্কে বেশ অসচেতন এবং বেপরোয়া। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের দেশের সড়ক ব্যবস্থাপনার অবস্থা ভয়াবহ রকমের নাজুক। কিন্তু অধিকাংশ মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে যতটা না দুর্বল সড়ক অবকাঠামোকে দায়ী করা যায়, তার চেয়ে ব্যক্তি সচেতনতা কিংবা নাগরিক সচেতনতার অভাবই বেশি দেখা যায়।

মোটরবাইক চালানোর সময় সামান্য এক মুহূর্তের অমনোযোগ ভয়াবহ রকমের দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। অথচ ঢাকার রাস্তাগুলোতে বাইক চালানোর সময় মুঠোফোনে কথা বলা, পানি পান করা, হেলমেট না পরা কিংবা সিগন্যাল না মানার মতো ব্যাপারগুলো প্রায়ই চোখে পড়ে। বন্ধুরা মিলে গতির প্রতিযোগিতায় প্রায়শই মেতে উঠছে অবাধ্য তারুণ্য। এ ধরনের বেপরোয়া গতির কারণেও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হতে হচ্ছে তাদের।

তরুণ এই বাইক চালকদের অধিকাংশই যথাযথ প্রশিক্ষণ কিংবা দক্ষতা অর্জন না করেই মহাসড়কে বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে। ফলত, অজান্তেই তারা নিজেদের জীবনের জন্যে ঝুঁকি ডেকে আনছে। যে তারুণ্য অপার সম্ভাবনাময়, আমরা চাই না সে তারুণ্য ঝরে যাক অকালেই। জীবনের প্রতি সচেতনতাবোধ বৃদ্ধি, নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ব্যাপারে সতর্ক থাকার মাধ্যমে এমন অসংখ্য দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। আমরা তারুণ্যের মৃত্যু সংবাদ নয় বরং দেখতে চাই দুর্বার তারুণ্যের বিজয়গাঁথা।

ইএলটি সম্মেলন

পৃষ্ঠা ১ এর পর

টেসল ইন্টারন্যাশনালের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর অ্যান্ডি কার্টিস। প্রফেসর কার্টিস তাঁর বক্তব্যে গতানুগতিক শিক্ষককেন্দ্রীক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রীক শিক্ষাব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সম্মেলনে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী। তিনি ইউল্যাবের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিবাচক অবদানের কথা জোরালোভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর থেকে এগিয়ে আছে মূলত তাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাফল্য ও অবদানের কারণে।

আধুনিক বিশ্বে ইংরেজি শিক্ষার অপরিহার্যতা তুলে ধরে ইউল্যাবের উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমান বলেন, বিশ্বায়ন যেখানে সমগ্র বিশ্বকে একটি একক কর্মক্ষেত্রে পরিণত করেছে, সেখানে ইংরেজির প্রয়োজনীয়তা এড়িয়ে চলার কোনো পথ নেই।

তাঁর সুরেই কণ্ঠ মেলান অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ব্রিটিশ কাউন্সিলের কান্ট্রি ডিরেক্টর ব্রেডেন ম্যাকশেরি।

ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন দেশের মানুষদের এ মিলনমেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল ইউল্যাব অডিটোরিয়ামসহ শ্রেণিকক্ষগুলোতে বসা অসাধারণ সব প্যানেল। এসব প্যানেলে শিক্ষাবিদরা তাদের বিভিন্ন গবেষণা উপস্থাপন করেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ইউল্যাবের ইংলিশ অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ বিভাগের পাঁচজন শিক্ষার্থীর সৌভাগ্য হয় আন্তর্জাতিক এই কনফারেন্সে তাদের গবেষণাপত্র উপস্থাপন করার। আসিফ চৌধুরী, সৈয়দা আকসা আঞ্জুমান, ইফফাত সুলতানা, সালওয়া চৌধুরী ও সারাফ আঞ্জুম একক ও দলীয়ভাবে দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য শিক্ষাবিদদের সামনে তাদের গবেষণা উপস্থাপন করেন। ব্রিটিশ কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত বিশেষ প্যানেল ডিসকাশনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে। এই প্যানেলে একবিংশ শতাব্দীর ক্লাসরুমের কাঙ্ক্ষিত চিত্রটি তুলে ধরা হয়। বিশাল এ কর্মযজ্ঞকে সফল করতে সম্মেলনের কমিটিতে ছিলেন ইংরেজি ও মানববিদ্যা বিভাগের প্রধান কায়সার হক, সাজেদুল হক, আরিফা গনি রহমান, সামশাদ মর্তুজা, শাহনেওয়াজ কবির, শায়েখ-উল-সালেহিন, গোলাম সারওয়ার, অমিয় সাদনাম চৌধুরী ও নাসরিন সুলতানা।

ইউল্যাবে

বাজেট নিয়ে আলোচনা

শুভ বসাক নিকুঞ্জ

ইউল্যাবের 'স্কুল অব বিজনেস'-এর আয়োজনে গত ১৫ জুলাই, ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেটের উপর এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ইউল্যাব অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এই আলোচনার শিরোনাম ছিল 'বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বাজেট ২০১৪-২০১৫'। ইউল্যাবের উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমানের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠানের মূল আয়োজন। এরপর ইউল্যাব স্কুল অব বিজনেসের এসোসিয়েট প্রফেসর ড. পিঙ্কি শাহ্ প্রধান বক্তা অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হুসেইন-এর পরিচয় তুলে ধরেন।

ড. জাহিদ হুসেইন বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ হিসেবে কর্মরত আছেন। প্রশ্নোত্তরভিত্তিক এই আলোচনায় তিনি বাংলাদেশের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেটের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় তুলে ধরেন। আলোচনা অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য দেন ইউল্যাব স্কুল অব বিজনেসের ডিন প্রফেসর গোলাম মোহাম্মাদ। ইউল্যাবের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. এইচ এম জহিরুল হক, স্কুল অব বিজনেসের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পত্রিকাটি পাঠকের মতামতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে বদ্ধপরিকর। আপনার মুল্যবান মতামত আমাদের জানাতে পারেন নির্দ্বিধায় । কিংবা আপনিও হয়ে উঠতে পারেন দ্য ইউল্যাবিয়ান পরিবারেরই একজন। আপনার লেখা গল্প, ফিচার, ছবি, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায়
ulabian@ulab.edu.bd

রবীন্দ্র-নজরুল জন্মোৎসবের আয়োজনে প্রফেসর কাজী মদিনা, ড. তপতি রানী সরকার, প্রফেসর রফিকুল ইসলাম ও ড. বেগম জাহান আরা

ইউল্যাবে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও লেখক ফারুখ ডন্ডি

মনন মুনতাকা

রূপান্তর বা অভিযোজন হচ্ছে কোনও কিছুকে এক রূপ থেকে অন্য আরেকটি রূপে নিয়ে যাওয়া। আমরা সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিতন্ত্রের দিকে যাচ্ছি। কথাগুলো বলেছেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার, লেখক, প্রযোজক ও পরিচালক ফারুখ ডন্ডি। গত ২২ মে ২০১৪ ইউল্যাব-এর ধানমন্ডিস্থ ক্যাম্পাসে তিনি সাহিত্যের অভিযোজন এবং তার মাধ্যমে নাটক বা চলচ্চিত্রে নতুন রূপদানের ওপর এক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

ইউল্যাবের ইংরেজি ও মানবিক বিভাগের প্রধান প্রফেসর কায়সার হক উপস্থিত অতিথিদের কাছে ফারুখ ডন্ডি'র পরিচিতি তুলে ধরেন।

ডন্ডি তাঁর বক্তব্যে বলেন, একটি সফল অভিযোজন করতে হলে অবশ্যই একটি সমান্তরাল প্রেক্ষাপট চিন্তা করতে হবে। যখন মূল প্রেক্ষাপটটি দাঁড়িয়ে যাবে তখন প্রেম, শক্তি, মৃত্যু, দুর্দশার মতো অন্যান্য প্রেক্ষাপটও খুব সহজেই আনা যায়। উদাহরণ হিসেবে তিনি শেকসপিয়রের গল্পকে খুব সহজেই একটি বাংলা গল্পে রূপান্তর করার কথা উল্লেখ করেন। কারণ শেকসপিয়রের তখনকার সামাজিক প্রেক্ষাপট বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটেরই প্রতিচ্ছবি।

ফারুখ ডন্ডি ভারতের বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'মঙ্গল পান্ডে' এবং 'কিসনার' কাহিনীকার ছিলেন। তিনি নিয়মিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কলাম লেখেন এবং যুক্তরাজ্যের 'চ্যানেল ৪' এর কমিশনিং সম্পাদক ছিলেন। তিনি ২০১১ সালে বিখ্যাত সুফি কবি জালাল উদ্দিন রুমির কবিতা অনুবাদ করেন। ২০১৩ সালে শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস দেবদাস-এর অভিযোজিত নাটক লন্ডনে মঞ্চায়িত হয় এবং 'দ্যা কে ফাইল' নামের একটি ছোট চলচ্চিত্রেরও কাহিনীকার এই ফারুখ ডন্ডি। তাঁর সর্বশেষ অনুবাদ হারপার কলিন্সের বই 'প্রফেট অফ লাভ' এই বছরই প্রকাশিত হয়।

ফারুক ডন্ডি তাঁর বক্তব্য শেষে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাবের উপ-উপাচার্য প্রফেসর এইচ. এম. জহিরুল হক, মিডিয়া স্টাডিজ ও জার্নালিজম বিভাগের প্রধান প্রফেসর জুড হেনিলো, ইউল্যাব কমিউনিকেশন ও স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্সের উপদেষ্টা জুডিথা ওলমেখার।

রবীন্দ্র-নজরুল জন্মোৎসব উদযাপন

ইউল্যাবিয়ান প্রতিবেদক

বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য দুটি অঙ্গ রবি ঠাকুর আর কাজী নজরুল। আমাদের প্রেম, বিরহ, দ্রোহ কিংবা বিপ্লব সব কিছুতেই জড়িয়ে আছেন এই দুই মহামানব।

এই দুই মহতের সৃষ্টি নিয়ে ইউল্যাব গত ৮ জুন আয়োজন করে 'রবীন্দ্র-নজরুল জন্মোৎসব'-এর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোকপাত, ভিডিওচিত্র প্রদর্শনী, আর ফাঁকে ফাঁকে ইউল্যাব সংস্কৃতি সংসদের সদস্যদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা, এমন সব রকমারি আয়োজন শুরু থেকেই দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট নজরুল গবেষক প্রফেসর রফিকুল ইসলাম। ইউল্যাবের উপ-উপাচার্য প্রফেসর এইচ. এম. জহিরুল হক অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের উদ্দেশ্যে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। তারপর ইউল্যাবের সংস্কৃতি সংসদের সদস্যদের পরিবেশনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আকাশ ভরা সূর্য তারা' গানটির মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার কর্মশালায় ইউল্যাব শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ

সুরঞ্জিত বিশ্বাস সুমন

স্বাস্থ্য বিষয়ক সাংবাদিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিট। স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষায়িত সংবাদ পরিবেশন করা গণমাধ্যমগুলোর দায়িত্ব। গণমাধ্যমের উচিত আলাদা বিভাগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিষয়ে সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে মানুষকে এ বিষয়ে সচতেন করা। কথাগুলো বলেছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। ১১ মার্চ মঙ্গলবার সকালে সিরডাপ মিলনায়তনে 'রাইটিং অ্যাবাউট হেলথ: হ্যান্ডবুক ফর জার্নালিস্ট'-এর মোড়ক উন্মোচনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। এমিন্যান্স নামক একটি প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে ইউল্যাবের মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম বিভাগের দশ শিক্ষার্থী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে।

তথ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিষয়ক সাংবাদিকতায় গণমাধ্যম মালিক ও সম্পাদকদের সুযোগ সৃষ্টির আহ্বান জানিয়েছেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, আগে যারা গণমাধ্যমে কাজ করতেন তারা স্বাস্থ্য সাংবাদিকতায় ছাড়া ছাড়া সংবাদ পরিবেশন করতেন। বর্তমানে কিছুটা হলেও স্বাস্থ্য বিষয়ক সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তবে তা আশানুরূপ নয় বলে অসন্তোষ প্রকাশ করেন মন্ত্রী মহোদয়। তিনি মনে করেন, প্রতিটি গণমাধ্যমে স্বাস্থ্য বিষয়ক সংবাদ প্রকাশ করলে জনগণের স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বাড়তে বাধ্য।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে। ক্ষমতায় আসার পরপরই ১২ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এসব খবর পত্রিকাগুলোতে সঠিকভাবে আসে না অভিযোগ করে তিনি এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পরামর্শ দিয়ে সাংবাদিকদের অগ্রণী ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

দেশের স্বাস্থ্য সেবার উপর মানুষের আস্থা তৈরিতে সাংবাদিকদের কাজ করার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, স্বাস্থ্য বিষয়ে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য পাওয়া জনগণের অধিকার। নিত্যদিনের স্বাস্থ্য বিষয়ে সঠিক, সত্য ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জনগণকে জানাতে সাংবাদিকদের ভূমিকা রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বলেন, গণমাধ্যমগুলোতে স্বাস্থ্য বিষয়ক কোনো খবর গুরুত্বসহকারে প্রকাশ হয় না। ফলে স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে দেশের সিংহভাগ মানুষ কোনো তথ্য গণমাধ্যমের মাধ্যমে জানতে পারে না। গণমাধ্যমের উচিৎ অন্যান্য খবর যেভাবে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হয় স্বাস্থ্য বিষয়ে সেভাবে বিশেষ সংবাদ আলাদা বিভাগে প্রকাশ করা।

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

চিত্রনাট্য রচনার রসায়ন নিয়ে উপস্থিত অভ্যাগতদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন ফারুখ ডন্ডি

'পাশা' ও 'ভৈরব'-এর ইংরেজি ভাষান্তরের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত আলোচকবৃন্দ

নেতৃত্ব বিকাশে বিসিসিপির তিন মাসব্যাপী কর্মশালা

ফারিয়া মৌ

"লেখাপড়া করে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে"– এই কথাটি শুনে বড় হয়নি এমন কাউকে খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। তবে কি শুধু ভালো লেখাপড়া জানা বা পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া ছেলেটাই কেবল ভালো চাকরি পাবে আর তুলনামূলকভাবে কিছুটা খারাপ রেজাল্ট করা ছেলেটা মুখ গোমড়া করে বসে থাকবে? অবশ্যই না। কালের বিবর্তনে সে ধারণা আজ শিথিল হতে চলেছে।

আজকের দিনে ঘরে-বাইরে সর্বত্রই প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্বের। আর এই নেতৃত্বের গুণ একদিনে কারো মধ্যে গড়ে ওঠে না। এজন্য প্রয়োজন নেতৃত্বের চর্চা বা নিয়মিত নেতৃত্ব দানের সুযোগ। বর্তমানে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো ভালো রেজাল্টের পাশাপাশি অন্যান্য সহশিক্ষা কার্যক্রমকে বেশ ইতিবাচকভাবেই মূল্যায়ন করছে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশে যোগ্য নেতা গড়ে তোলার জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও আমাদের দেশে তেমন কোনো সুযোগ নেই। আর এই কারণে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের যোগ্য নেতার অভাব হতে পারে। সেই প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করে বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস (বিসিসিপি) তিন মাসব্যাপী 'স্টুডেন্ট লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ' শীর্ষক একটি ধারাবাহিক কর্মশালার আয়োজন করে। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে ইউল্যাব, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ও ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি। কর্মশালার জন্য প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে ১০০ জন করে শিক্ষার্থী বেছে নেওয়া হয়। এতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকরা অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ দেন। প্রশিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট কূটনীতিক মুহাম্মদ জমির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মেহতাব খানম, আনিস বড়ুয়া, প্রমা কনা, ইউল্যাবের সাবেক ছাত্র এবং ক্যারিয়ার বিষয়ক প্রশিক্ষক গোলাম সামদানী ডনসহ আরও অনেকে। পুরো কর্মশালার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছিলেন বিসিসিপি'র প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মিসেস মেহের আফরোজ। এছাড়া ইউল্যাবের প্রাক্তন ছাত্রী ও বিসিসিপি'র প্রোগ্রাম অফিসার ঈশিতা শারমিন রায়হান ও তানভীর আহমেদের সার্বিক সহায়তায় এই আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন হয়। কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

গত ১৪ আগস্ট ২০১৪-এ কর্মশালায় অংশ নেওয়া ইউল্যাবের সেরা দশের প্রেজেন্টেশন পর্ব শেষে উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমান এবং বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ মেহতাব খানম কৃতি এই দশ শিক্ষার্থীকে বিসিসিপি'র ইয়ুথ মেন্টরের ব্যাজ পড়িয়ে দেন। এদের মধ্যে সেরা দুইজনকে বিসিসিপিতে দুই বছরের ইন্টার্নশিপের সুযোগ দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়।

দীর্ঘ দিনব্যাপী এই কর্মশালার সফল আয়োজন করতে পেরে খুশি আয়োজকরা। তাদের আশাবাদ- এখান থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে অংশগ্রহণকারীরা দেশের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

কাজী শাহেদ আহমেদ এর 'পাশা' ও 'ভৈরব'-এর ইংরেজি ভাষান্তরের মোড়ক উন্মোচন

মনন মুনতাকা

এই দেশের শিল্প ও সাহিত্যাঙ্গনের প্রিয় মুখ কাজী শাহেদ আহমেদ। সম্পাদক, প্রকাশক কিংবা লেখক যেকোনো পরিচয়েই তাঁর রয়েছে স্বকীয়তার ছাপ। গত ৫ সেপ্টেম্বর বাংলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে জমকালো আর উৎসবমুখর পরিবেশে উন্মোচিত হলো তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'পাশা' এবং প্রথম উপন্যাস 'ভৈরব'- এর ইংরেজি ভাষান্তরের মোড়ক।

তাঁর আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়া দেশের শিক্ষা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা কিংবা রাজনৈতিক অঙ্গনের অনেক পুরোধারই দেখা মিললো বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে। প্রকাশনা উৎসব তাই পরিণত হল মিলনমেলায়।

সুলেখক কাজী শাহেদ আহমেদের উপন্যাস মানেই সময় ও জীবনের অনবদ্য দলিল। পাশাতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এমনটাই আশ্বস্ত করলেন সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক। উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় মানুষের জীবনধারা নিয়ে রচিত এই উপাখ্যান বাংলা সাহিত্যে ভিন্ন এক মাত্রা যোগ করলো বলেও তিনি মনে করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত কাজী শাহেদ আহমেদের পুত্র ও সাহিত্যিক ড. কাজী আনিস আহমেদের বক্তৃতায় উঠে এলো এই দেশের অনুবাদ সাহিত্যের দুর্বলতার চিত্র। বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যকে পরিচয় করিয়ে দিতে ভালো অনুবাদের কোনো বিকল্প নেই বলে তিনি মনে করেন।

এক্ষেত্রে ভৈরব উপন্যাসের বেশ ভালো ও যথার্থ অনুবাদ হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বইটির ইংরেজি অনুবাদক আরিফা গনি রহমানের প্রশংসা করেন।

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল নাট্যাংশের মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির একটি শৈল্পিক উপস্থাপনা।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ লেখক কাজী শাহেদ আহমেদ তাঁর বক্তৃতায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে জীবনঘনিষ্ঠ মজার অভিজ্ঞতা বলে দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন। একই সঙ্গে তিনি তাঁর পরবর্তী উপন্যাসের অগ্রগতির কথাও উল্লেখ করেন।

সবশেষে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রফেসর রফিকুল ইসলাম। তিনি কাজী শাহেদ আহমেদ-এর বাচনভঙ্গির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। পরে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মৌসুমী বড়ুয়া।

গ্রিনিং ইউল্যাব
সবুজের হাতছানি

আয়েশা খানম

দেশের প্রথম পরিবেশবান্ধব ক্যাম্পাস হিসেবে যাত্রা শুরু করলো ইউল্যাব। গত ২৬ জুন ২০১৪-এ 'গ্রিনিং ইউল্যাব' প্রজেক্টের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো সবুজের সঙ্গে মিতালী। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমান এর উদ্বোধন করেন।

পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব বর্তমানে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই পরিবেশের সঙ্গে বন্ধুতা আর সবুজের সঙ্গে বসবাস। ইউল্যাবের সেন্টার ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (সিএসডি)- এর তত্ত্বাবধানে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করার লক্ষ্যে দেশের স্বনামধন্য কাগজ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা পেপার মিলের কাছে প্রায় ২ মেট্রিক টন ব্যবহৃত কাগজ হস্তান্তর করা হয়।

এপ্রিল ২০১৪-এ মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত 'ফার্স্ট রিজিওনাল

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

গ্রিনিং ইউল্যাব এর আনুষ্ঠানিক যাত্রায় উপস্থিত ইউল্যাব কমিউনিকেশন ও স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্সের উপদেষ্টা জুডিথা ওলমেখার, প্রফেসর হামিদুল হক, ইউল্যাব উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমান ও ইউল্যাব রেজিস্ট্রার লে. কর্নেল মো. ফয়জুল ইসলাম

ইউল্যাব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাবের ঈদের পোশাক বিতরণ

শুভ বসাক নিকুঞ্জ

প্রতিবছর ঈদ আসে, আবার ঈদ চলে যায়। কিন্তু কিছু মানুষের জীবনে যেন ঈদ আসি আসি করেও পুরোপুরি ধরা দেয় না। এসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের মাঝে যেমন রয়েছে পথশিশু, ঠিক তেমনি রয়েছে হতদরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ।

ইউল্যাব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাব সুযোগ পেলেই সবসময় সমাজের এই সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের পাশে এসে দাঁড়ায়। 'ঈদ আনন্দ ছড়িয়ে পড়ুক সব বয়সী মানুষের জীবনে', এই স্লোগানকে সামনে রেখে ইউল্যাব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাব গতবছরের মতো এবারের ঈদে শুধুমাত্র পথশিশুদের মাঝে ঈদের পোশাক বিতরণকে সীমাবদ্ধ না রেখে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। সেই উদ্যোগের চূড়ান্ত রূপ হলো পথশিশু ও হতদরিদ্র মানুষদের মাঝে ঈদের পোশাক বিতরণ।

ইউল্যাব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাবের এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল অবহেলিত সেইসব শিশু ও দরিদ্র মানুষদের মুখে শুধু ঈদের দিনের জন্য হলেও কিঞ্চিৎ হাসি ফুটানো।

২৪ জুলাই ২০১৪-এ ইউল্যাব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাবের সদস্যরা মোহাম্মাদপুর বেড়িবাঁধের 'ঢাকা উদ্যান'– এর পার্শ্ববর্তী এলাকার পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সী সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের মাঝে ৯৬ সেট ঈদের নতুন পোশাক বিতরণ করে। এসব নতুন পোশাকের মধ্যে ছিল ছেলে শিশুদের জন্য ৫৬ সেট এবং মেয়ে শিশুদের জন্য ৪০ সেট পোশাক। পোশাক বিতরণ অনুষ্ঠান সকাল ১১টায় শুরু হয়ে শেষ হয় দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে। এছাড়া দুপুর ১টার দিকে ক্লাবের সদস্যরা ইউল্যাব ক্যাম্পাসের সামনে বয়োবৃদ্ধ শ্রমজীবী রিক্সা-ভ্যান চালকদের মাঝে ২২ সেট নতুন শার্ট বিতরণ করে।

উল্লেখ্য, গত ২৪ জুন ২০১৪-এ ইউল্যাব অডিটোরিয়ামে ইউল্যাব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাবের আয়োজনে এক 'চ্যারিটি কালচারাল শো' অনুষ্ঠিত হয়। দেড় ঘণ্টাব্যাপী সেই 'চ্যারিটি কালচারাল শো' অনুষ্ঠানটি ছিল ইউল্যাবের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীদের একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা। 'চ্যারিটি কালচারাল শো'র টিকিট বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়েই মূলত এসব নতুন পোশাক কেনা হয়।

ইউল্যাব টিভির বর্ষপূর্তির আনুষ্ঠানিক আয়োজনে ইউল্যাব এমএসজে'র শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

ইউল্যাব টিভির এক বছর পূর্তি

প্রমা সঞ্চিতা অত্রি

হাঁটি হাঁটি পা পা করে এক বছর পার করলো ইউল্যাব টিভি। এক ঝাঁক উদ্যমী তরুণদের নিয়ে শুরু করা দেশের প্রথম ও একমাত্র ক্যাম্পাস টেলিভিশন চালুর প্রথম উদ্যোগ সেই ২০১১ সালে। কিন্তু একটি টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করাটা খুব সহজ ছিল না। সকলের আগ্রহে ও দু'বছর নিরলস প্রচেষ্টায় অবশেষে সম্ভব হয় সেই কঠিন কাজটি। ২০১৩ সালের ২৭ জুন এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে ইউল্যাব টিভি। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজ উইক ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকার সাবেক সম্পাদক টুংকু ভারাদারাজান।

সীমিত পরিসর ও যন্ত্রপাতির নানা প্রতিকূলতা স্বত্ত্বেও এগিয়ে চলছে ইউল্যাব টিভি। ইউল্যাব টিভি প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত কর্মস্থলে চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান করা। জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে ইউল্যাব মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম বিভাগের প্রধান প্রফেসর জুড উইলিয়াম হেনিলো বলেন, ইউল্যাব টিভিকে তার জন্মদিনে অনেক অনেক আন্তরিক শুভেচ্ছা। ইউল্যাব টিভির প্রথম জন্মদিনে আমি এর দীর্ঘায়ু ও উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। টেলিভিশনে কাজ করার মূল চালিকাশক্তি হলো বারবার এর আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো চর্চা করা। যা শিক্ষার্থীরা ইউল্যাব টিভির মাধ্যমে করতে পারছে। আমরা সব সময় শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতাকে মূল্য দিয়ে থাকি। কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির গোপন সূত্র হলো অনুশীলন। কোনো কাজ বারবার করে অনুশীলন করার মাধ্যমেই কর্মদক্ষতাকে বাড়িয়ে তোলা সম্ভব। ইউল্যাব টিভি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল যাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা ক্যামেরার কাজ, পরিচালনা, এডিটিং, স্ক্রিপ্ট রাইটিং এই বিষয়গুলোতে দক্ষ হয়ে ওঠে যা পরবর্তীতে তাদের কর্মক্ষেত্রে একজন যোগ্য কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়ে ইউল্যাবের উপ উপাচার্য প্রফেসর জহিরুল হক বলেন, আগামীতে শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনে সাফল্যের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ইউল্যাব টিভি। তিনি আরও বলেন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যেটা হয়-শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া শেষ করে সার্টিফিকেট পাবার পর তারা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে গিয়ে হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ পায়; কিন্তু ইউল্যাবের ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের নিজস্ব টেলিভিশন চ্যানেল থাকার ফলে ছাত্র অবস্থায় থাকতেই কাজ শেখার সুযোগ পাচ্ছে। তারা হাতে কলমে কাজ শিখতে পারছে। আমি খুবই গর্বিত যে, ইউল্যাবের মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টটি বাংলাদেশের অন্যতম সেরা একটি ডিপার্টমেন্ট।

মানসম্মত ও দক্ষ মিডিয়াকর্মী তৈরিতে ইউল্যাব টিভি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে মনে করেন ইউল্যাবের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। যদিও এখনই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে খুব ভালো কাজ হবে এমনটি আশা করছেন না তারা, কিন্তু নিজেকে তৈরি করে নেওয়ার জন্য খুব ভালো একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ইউল্যাব টিভির বিকল্প নেই বলেই মনে করছেন সবাই।

অনুষ্ঠানে বক্তব্যদান করছেন ইউল্যাব উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমান

ইউল্যাব ফিল্ম ক্লাবের আয়োজনে সিরিজ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

সামিউল ইসলাম শোভন

ইউল্যাব ফিল্ম ক্লাবের আয়োজন মানেই চমক! প্রতিবারের মতো এবারও ফিল্ম ক্লাবের আয়োজনে ছিল ভিন্নতা ও স্বকীয়তা। 'লিডারস্ এন্ড লিডারশিপ' এর ওপর নির্মিত বিশ্বের সেরা সিনেমাগুলো নিয়ে ফিল্ম ক্লাব আয়োজন করে সিরিজ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর। ৭ আগস্ট ২০১৪-এ ইউল্যাব অডিটোরিয়ামে বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার জীবনী নিয়ে তৈরি করা 'ম্যান্ডেলা: লং ওয়াক টু ফ্রিডম' চলচ্চিত্রটি প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাবের উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমান। চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর এই আয়োজনকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, এ ধরনের আয়োজন আরও করা উচিত। প্রফেসর ইমরান ফিল্ম ক্লাবকে ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। অন্যদিকে ছবি দু'টির প্রদর্শনী শেষে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর সলিমুলাহ খান ম্যান্ডেলার জীবন ও কর্ম নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেন এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কো-কারিকুলার কো-অর্ডিনেটর তাহমিনা জামান, ফিল্ম ক্লাবের উপদেষ্টা বিকাশ সিএইচ ভৌমিক এবং জেনারেল এডুকেশন বিভাগের প্রভাষক আজিজুল রাসেল।

আনুষ্ঠানিক আয়োজন শেষে প্রফেসর বো রেইমারকে অভিনন্দিত করছেন ইউল্যাব এমএসজে প্রধান প্রফেসর জুড উইলিয়াম হেনিলো

ইউল্যাবে প্রফেসর বো রেইমার

মনন মুনতাকা শোভা

মালমো ইউনিভার্সিটির মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন স্টাডিজের শিক্ষক প্রফেসর বো রেইমার। গত ১১ আগস্ট তিনি ইউল্যাব-এর ধানমন্ডিস্থ ক্যাম্পাসে ডিজাইন, প্রোডাকশন, কনজাম্পশন, কন্সেপচুয়ালাইজিং কলাবরেশন মিডিয়া প্র্যাকটিসের ওপর এক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ইউল্যাবের মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগের পক্ষ থেকে এই আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ইউল্যাবের মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগের প্রফেসর ড. তাবাসসুম জামান উপস্থিত অতিথিদের কাছে প্রফেসর বো রেইমারের পরিচিতি তুলে ধরেন। প্রফেসর বো রেইমার মালমো ইউনিভার্সিটি সুইডেনের কলাবরেশন মিডিয়া ইনিশিয়েটিভ-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক।

তাঁর প্রকাশিত একাডেমিক বইয়ের সংখ্যা চার। তাঁর সর্বশেষ বই 'কলাবরেটিভ মিডিয়া', ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয়।

প্রফেসর রেইমার বলেন, এখনকার মিডিয়ায় ল্যান্ডস্কেপ, প্রোডাকশন এবং কনজাম্পশনের সম্পর্ক দিন দিন বাড়ছে আর মজবুত হচ্ছে। আগে শুধু কিভাবে মিডিয়াকে ব্যবহার করা যায় সে চিন্তা করা হতো কিন্তু এখন নতুন মিডিয়া কিভাবে উৎপাদন করা যায় সেই চিন্তাটা বাড়ছে। অনেকে ব্লগ লিখছে, ছবি তুলছে, ফিল্ম এডিট করছে এবং তাদের কাজ তারা অনলাইনে আপলোড করছে। কলাবরেশন মিডিয়া প্র্যাকটিসে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে প্রফেশনাল ডিজাইনার ও প্রডিউসাররা কাজ করবে মিডিয়ার সঠিক অবকাঠামো নিয়ে। আর বিভিন্ন ডিজাইন হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ব্যবহার করবে মিডিয়া তৈরিতে।

মিডিয়া রিসার্চারের নতুন ভূমিকা সম্পর্কেও কথা বলেন প্রফেসর রেইমার। আলোচনা শেষে তিনি ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। অনুষ্ঠানে ইউল্যাবের পক্ষ থেকে বো রেইমারের হাতে উপহারসামগ্রী তুলে দেন উপাচার্য অধ্যাপক ইমরান রহমান ও মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জুড উলিয়াম হেনিলো। অনুষ্ঠানে ইউল্যাবের উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমান, মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জুড উইলিয়াম হেনিলো ছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাবের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী ও আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

অ্যাডভান্স সিনেমাটোগ্রাফি কর্মশালা নিয়ে
ইউল্যাবে রাশেদ জামান

প্রমা সঞ্চিতা

সময়ের অন্যতম ব্যস্ত ও গুণী সিনেমাটোগ্রাফার রাশেদ জামান। স্থাপত্যবিদ্যায় উচ্চতর ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও ভালোবাসার টানে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন সিনেমাটোগ্রাফিকে। তুরস্কের মিডল ইস্ট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে স্থাপত্যবিদ্যায় লেখাপড়া শেষ করে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, লস অ্যাঞ্জেলস (ইউসিএলএ) থেকে সিনেমাটোগ্রাফিতে ডিপ্লোমা করেন।

প্রায় দুই বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে সিনেমাস্কোপের আহ্বানে ইউল্যাবে আসেন বিশিষ্ট সিনেমাটোগ্রাফার রাশেদ জামান। ২৯ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর– এই চারদিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তিনি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সিনেমাটোগ্রাফির নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। কর্মশালায় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে বিস্তারিত অলোচনা করেন এই গুণী সিনেমাটোগ্রাফার।

'সিনেমাস্কোপ'–এর পরামর্শক মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন বলেন, রাশেদ জামান এই সময়ের চিত্রগ্রাহকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর মতো একজন পেশাদার ও সার্থক সিনেমাটোগ্রাফারের সঙ্গে যাতে সিনেমাস্কোপ সদস্যদের পরিচয়ের সুযোগ ঘটে সে জন্যই তাকে ইউল্যাবে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা।

কর্মশালার প্রথম দিনে তিনি মূলত সিনেমাটোগ্রাফি কি এবং কেন গুরুত্বপূর্ণ এই সম্পর্কে আলোচনা করেন। বিশ্ববিখ্যাত সিনেমাটোগ্রাফারদের পরিচয় ও তাদের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন। এছাড়া তার কাজের ধরন ও বৈশিষ্ট্য নিয়েও কথা বলেন। পরবর্তী দিনগুলোতে তিনি বিশদভাবে সিনেমাটোগ্রাফি ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়, যেমন-লাইটিং, প্রোডাকশন ডিজাইন, কালার, কম্পোজিশন, ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল, লেন্স ও ফ্রেমিংয়ের নান্দনিকতা বিষয়ে আলোকপাত করেন।

কর্মশালার শেষ দিনে তিনি ৩৫ মিমি ক্যামেরা দিয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে হাতেকলমে ক্যামেরা পরিচালনা শেখান। ৩৫ মিমি ক্যামেরা হাতে নেওয়ার এই বিরল সুযোগ আনন্দের সঙ্গেই উদযাপন করেছে ইউল্যাবের শিক্ষার্থীরা।

এই প্রসঙ্গে সিনেমাস্কোপের সিইও জাহিদ গণণ বলেন, আমরা আসলে প্রায় দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে চেষ্টা করছিলাম রাশেদ জামানকে ইউল্যাবে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় নিয়ে আসতে। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে তিনি সময় দিতে পারছিলেন না। আমাদের দীর্ঘ দুই বছরের এই অপেক্ষা অবশেষে সফল হয়েছে বলা যায়।

পুশকিন দিবসে
সাহিত্য ও স্বাধীনতার কথা

শুভ বসাক নিকুঞ্জ

আলেক্সান্দর সের্গেইয়েভিচ পুশকিন, আধুনিক রুশ সাহিত্যের একজন বিখ্যাত রোমান্টিক কবি। 'পুশকিন' নামেই সারা বিশ্বে পরিচিত এই কবি। অনেক সাহিত্য সমালোচকের দৃষ্টিতেই তিনি আধুনিক রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। একই সঙ্গে তাঁকে আধুনিক রাশিয়ান সাহিত্যের জনকও বলা হয়। পুশকিন প্রথম রাশিয়ান কবি যিনি সর্বপ্রথম কবিতা এবং নাটকে ভার্নাকুলার বাচনভঙ্গির ব্যবহার শুরু করেন।

৮ জুন ২০১৪-এ ইউল্যাব অডিটোরিয়ামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংলিশ অ্যান্ড হিম্যানিটিজ বিভাগ এবং রাশিয়ান কালচারাল সেন্টারের আয়োজনে 'আলেক্সান্দর পুশকিন ও রাশিয়ান সাহিত্য' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে বাংলাদেশে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্দর এ. নিকোলভ 'পুশকিনের কাজ, পাণ্ডুলিপি ও চিত্রাঙ্কন'–এর ওপর এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ইউল্যাবের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. এইচ এম জহিরুল হক তাঁর স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন। ইউল্যাবের ইংলিশ অ্যান্ড হিম্যানিটিজ বিভাগের প্রধান প্রফেসর কায়সার হক

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্দর এ. নিকোলভ

শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রধান অতিথিকে পরিচয় করিয়ে দেন। বাংলাদেশে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্দর এ নিকোলভ, বিশ্বসাহিত্যে আলেক্সান্দর পুশকিনের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরে প্রখ্যাত লেখক ও গবেষক প্রফেসর সৈয়দ এ মাকসুদ, গবেষক প্রফেসর হায়াৎ মাহমুদ, প্রথম আলো'র সহকারী প্রধান সম্পাদক জাহিদ রেজা ও সুমনা মঞ্জুর রাশিয়ান সাহিত্য ও আলেক্সান্দর পুশকিনের সাহিত্যের বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক সবার সামনে তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে ইউল্যাবের উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমান সংশিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যাক্ত করেন।

অ্যাটকিন সিটিস্কেপ পুরস্কারজয়ী আলোকচিত্র 'লাইফ ইন দ্য সার্কেল', আলোকচিত্রী: ফয়সল আজিম

ভাসমান জীবনের গল্প

এ এস এম রিয়াদ আরিফ

ঘর নেই, তবু আছে ঘর করা। তবুও আছে স্বপ্ন ও বেদনা। আছে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির জটিল হিসেব-নিকেষ। রাজধানীর সদরঘাটের ঘরহীন মানুষগুলোর গল্পটা একটু অন্যরকম। ওদের মধ্যে কেউ কুলি, কেউ নৌকার মাঝি আবার কেউবা ফেরি করে বেড়ায়। সেই ভোর থেকে শুরু করে গভীর রাত অবধি চলে তাদের জীবনযাপন।

হরিপদ কেরানীর মতো ওদের ঘরে আলো জ্বালাবার দায় নেই। তাই লঞ্চঘাটের ঠিকরে পড়া নিয়ন আলোতেই রাত্রি কেটে যায়। আবার ভোর হয়। লঞ্চের ভেঁপু বাজে। পুষ্টিহীন শরীরগুলোর ক্লান্তিহীন পথচলা শুরু হয়। কিন্তু ওদের পথচলা, দুপুরে পেট পুরে খাবারের নিশ্চয়তা দেয় না।

অধুনিক নগর সভ্যতা এই মানুষগুলোর একটা নাম দিয়েছে। ওদের বলা হয় ভাসমান মানুষ। এক সময়ের প্রমত্তা নদী বুড়িগঙ্গা এই বৃদ্ধকালে এসেও আশ্রয় দিয়েছে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালের ভাসমান মানুষদের।

চাঁদপুরের পঙ্গু মাজেদ আলী, নোয়াখালীর হাশেম মিয়া, নদী ভাঙনে সর্বস্ব হারানো রহিমা বেওয়া-ওরা সবাই আজ রাজধানীর সদরঘাটের বাসিন্দা। জীবনের তিক্ত স্রোত ওদের সবাইকে নিয়ে এসেছে এই মোহনায়।

এদের মধ্যে হাশেম নৌকা বানায়। মেহগনি আর কাঁঠাল কাঠ দিয়ে বানানো নৌকা তার জীবিকা মেটায়। মাজেদ আলীর খাবার জোটে ভিক্ষে করে; পঙ্গুত্বই তার জন্য হয়েছে আশীর্বাদ! ঘরহীন এই মানুষগুলোর ঘরে ফেরার তাড়া নেই। প্রত্যাশার প্রাচীর নেই। আছে শুধু বেঁচে থাকা আর বেঁচে থাকার লড়াই।

প্রায় বিশ বছর আগে উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকায় পাড়ি জমিয়েছিলেন সদরঘাটের নৌকার মাঝি রমজান। তখন বুড়িগঙ্গার জল এতটা কালো ছিল না। বুড়িগঙ্গার এপার থেকে ওপার। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অসংখ্য মানুষকে পারাপার করায় সে। দৈনিক উপার্জনটা মোটামুটি ২০০ টাকার মতন।

সদরঘাটের লঞ্চ টার্মিনালগুলোতে আরেক শ্রেণির মানুষের দেখা পাওয়া যায় বেশ সহজেই। ভারি ব্যাগ-বস্তাসহ লঞ্চ ধরতে আসা যাত্রীদের দেখলেই ওরা ছুটে আসে। ওরা কুলি। সদরঘাট টু বরিশাল, সদরঘাট টু সুন্দরবন, সদরঘাট টু শরীয়তপুর। মানুষ গন্তব্যে যায় আবার ফিরেও আসে। ভাসমানদের কোনো ঘর নেই, তাই ওদের ফেরা কিংবা যাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। জীবনের নির্মমতা আর নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সখ্যতা গড়া সদরঘাটের এই মানুষগুলো বাস করে চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। শহরের সকল বর্জ্য গিয়ে মেশে যে বুড়িগঙ্গার জলে সেই জলেই চলে ওদের স্নানপর্ব। ভাসমান মানুষদের খাবারের জন্য আছে ভাসমান খাবার দোকান। এখানে সকালের নাস্তা মেলে ১০-১৫ টাকায়। আর ২০-২৫ টাকাতেই হয়ে যায় রাতের ভুরিভোজ।

তেমনি এক হোটেলে রান্না করে শেফালির মা। রাত হলেই মা-মেয়ে ওয়াইজ ঘাটের দিকে ছোট্ট একটা জায়গায় জড়াজড়ি করে ঘুমায়। দশ বছরের শেফালির স্কুলে যাবার ইচ্ছে, মাঝে সাজে টেলিভিশন দেখার ইচ্ছে, একবেলা পেট পুরে মোরগ পোলাও খাবার ইচ্ছে।

শেফালির মতো সদরঘাটের শিশুদের শৈশব হারিয়ে যাচ্ছে জীবনের কঠিন পদাঘাতে। ভেঁপুর প্রচণ্ড শব্দের মাঝেই দিন যাপন এদের। ফলে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যে ঘটছে ভয়াবহ ব্যাঘাত।

তবুও দাঁড়িয়ে আছে সদরঘাট আর সদরঘাটের মানুষজন। এদের মধ্যে হাশমত আর মমেনার গল্পটা একটু অন্যরকম। কুড়িগ্রামের মেয়ে মমেনার সঙ্গে হাশমতের পরিচয় সদরঘাটেই। তারপর সখ্যতা এবং ঘর বাঁধা। পলিথিনে মোড়ানো কুঠুরিতেই চলছে তাদের সংসার।

সন্ধ্যার খানিকটা আগেই মমেনার উনুনে জ্বলে ওঠে আগুন। আকাশে মেঘ করলে সেদিনের মতো রান্নাবান্না ওখানেই শেষ। খাবার নিশ্চয়তা নেই তবু চলে জীবন।

উৎসব আর উত্তাপহীন ভাসমান জীবন এগিয়ে যায় অনাগত সন্ধ্যার পথে। একটু পরেই রাত্রি নামে। ক্ষুধার জ্বালা, অপ্রাপ্তির বেদনা, সবই মিলে যায় অন্ধকারে। এরই মাঝে চলে ঘরহীন মানুষের ঘর করা অথবা ঘর করার স্বপ্ন বোনা।

জন্মোৎসব উদযাপন

পৃষ্ঠা ৩ এর পর

আয়োজন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোকপাত করেন ইউল্যাব ইমেরিটাস এবং নজরুল গবেষক প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, ড. বেগম জাহান আরা, প্রফেসর কাজী মদিনা ও ড. তপতি রানী সরকার। তারা উপস্থিত অতিথিদের রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বেশকিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের স্বকণ্ঠে গান ও কবিতা আবৃত্তি'র ভিডিও প্রদর্শন। আলোচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র ও নজরুলের ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্বন্ধে সবাই একটা পরিষ্কার ও স্পষ্ট ধারণা পায়। অনেক অজানা তথ্য উঠে আসে প্রফেসর রফিকুল ইসলামের আলোচনায়।

কাজী নজরুল ইসলামের 'দুর্গমও গিরি' গানটি পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানে আগত অতিথি এবং অংশগ্রহণকারীদের সবাই বাঙালীর ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করেন, যা অনুষ্ঠানটিকে আরও উৎসবমুখর ও আকর্ষণীয় করে তোলে। অন্যান্যের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেজিস্ট্রার লে. কর্নেল মো. ফয়জুল ইসলাম, প্রফেসর আবুদল মান্নান, ইউল্যাবের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও অন্য অতিথিবৃন্দ। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন ড. মিন্টু কৃষ্ণ পাল এবং তবলায় ছিলেন পণ্ডিত দিলিপ কুমার চক্রবর্তী।

স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার কর্মশালা

পৃষ্ঠা ৩ এর পর

স্বাস্থ্য বিষয়ক এই বইটি সংবাদকর্মীদের জন্য জরুরি, এমন মন্তব্য করে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এমিন্যান্সকে ধন্যবাদ জানান মন্ত্রী মহোদয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউএসএইড বাংলাদেশ- এর ডেপুটি ডিরেক্টর গ্রেগরি জে এডমাস, প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) জামাল হোসাইন, এমিন্যান্স'র সিইও ড. শামিম তালুকদার ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

গ্রিনিং ইউল্যাব: সবুজের হাতছানি

পৃষ্ঠা ৪ এর পর

কনফারেন্স অন ক্যাম্পাস সাসটেইনেবিলিটি'তে ইউল্যাবের এই প্রজেক্টটি পুরস্কার লাভ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে পরিবেশ সচেতনতা এবং সামাজিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী ৪০০টিরও অধিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। শক্তি ও সম্পদ সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য হ্রাস ও পুনর্ব্যবহার, নবায়নযোগ্য কাঁচামাল ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে তারা। ইউল্যাবের এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশও সে পথে পা বাড়ালো।

গ্রিনিং ইউল্যাবের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপ-উপাচার্য প্রফেসর এইচ. এম. জহিরুল হক, রেজিস্ট্রার লে. কর্নেল মো. ফয়জুল ইসলাম, ইউল্যাব কমিউনিকেশন ও স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্সের উপদেষ্টা জুডিথা ওলমোখার এবং বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেঘ আর পাহাড়ের নগরে

যূথী রায় ঋষিতা

অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি সিলেট। প্রকৃতির এমন রূপ আর ঐশ্বর্য সহজে মেলে না। বিস্তৃত চা বাগান, দিগন্ত ছুঁতে চাওয়ার স্পর্ধা দেখানো পাহাড়ের সারি, অবিরাম জলপ্রপাতের মনমাতানো শব্দ সিলেটকে করেছে অপরূপ। আর কে না চায় এই অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে। সেই সবুজে ঘেরা রাজ্যে ছুটে যাবার ইচ্ছে ছিল দীর্ঘদিনের। অবশেষে আনিস আলমগীর স্যারের প্ল্যান আর আমাদের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন পূরণ!

সময়টা আগস্টের ঠিক মাঝামাঝি। ঝুম বৃষ্টির মৌসুম। এরই মাঝে ১৩ আগস্ট রাতে মোট ৪১ জন যাত্রী নিয়ে শুরু হয় আমাদের যাত্রা। প্রথম গন্তব্য শ্রীমঙ্গল। পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেজে গেল সকাল ৬টা। তারপর বাস থেকে নেমে সোজা গেস্ট হাউসে ওঠা। বাংলাদেশের সর্বাধিক বৃষ্টিবহুল এলাকা শ্রীমঙ্গল। আমরাও পড়ে যাই সেই বৃষ্টির পাল্লায়। কী আর করা! বৃষ্টির কারণে আমাদের প্ল্যান পরিবর্তন আসে। সকালের নাস্তা শেষ করে কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে সবাই মিলে যাই একটি চা তৈরির কারখানায়। ঘুরে ঘুরে আমাদের দেখানো হয় চা তৈরির সকল প্রক্রিয়া। চায়ের পাতা শুকিয়ে কিভাবে ধাপে ধাপে চা তৈরি হয় সে দুর্লভ ব্যাপারটাও জানা হয়ে যায়। আমাদের এবারের গন্তব্য মাধবপুর লেক। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই মাধবপুরের চারপাশে পাহাড় আর মাঝে লেক। অপূর্ব সেই সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত যেন মনের খাতায় লিখে রাখার মতো। মাধবপুর লেক থেকে আমরা যাই নীলকণ্ঠ। সিলেটের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিস হল এই নীলকণ্ঠের চা। এখানে ভুবনবিখ্যাত রমেশ রামগৌড়ের সাত রকম লেয়ারের চা তৈরি হয়। আমাদের দেশের আর কেউ এই চা তৈরি করতে পারে না। রমেশের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেই একমাত্র এই ফর্মুলার চা বানায়। তাঁর নীলকণ্ঠ চা কেবিনে সাত লেয়ারের চা ৭০ টাকা, ছয় লেয়ারের চা ৬০ টাকা, পাঁচ লেয়ারের চা ৫০ টাকা, চার লেয়ারের চা ৪০ টাকা করে পড়ে। নীলকণ্ঠ থেকে আমরা চলে যাই গেস্ট হাউসে। শেষ হয় আমাদের প্রথম দিনের যাত্রা।

পরদিন আমাদের গন্তব্য সিলেট। সকালে বাসে করে আমাদের যাত্রা শুরু হয় জাফলংয়ের পথে। বৃষ্টির কারণে জাফলং ভালোভাবে ঘুরে দেখা সম্ভব হয়নি। তবুও আমরা বৃষ্টিতে কাক ভেজা হয়ে কয়েকবার জাফলংয়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে বের হই। বাসে বসে দুই পাশের অপূর্ব সব দৃশ্য দেখতে দেখতে সময় কেটে যায়। বিকেলের দিকে আমরা ফিরে আসি সিলেট শহরে। সিলেটে গোল্ডেন সিটি হোটেলে ওঠার পর ফ্রেশ হয়ে সন্ধ্যায় চলে যাই সিলেট শহরের ঐতিহ্যবাহী কীণ ব্রিজ দেখতে। ব্রিজের ব্যাতিক্রমী ডেকোরেশন ও লাইটিং যেন রাতের আঁধারকে আলোকিত এক উৎসবে পরিণত করেছে। রাতে সবাই গোল্ডেন সিটিতে একসঙ্গে রাতের খাবার শেষ করে রাতের সিলেট দেখতে হাঁটতে বের হই। এভাবে শেষ হয় আমাদের সিলেট ভ্রমণের ২য় দিন। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দুপুর ১২টার দিকে পানসিতে খেতে যাই। এখানে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী ভর্তাসহ অনেক খাবার পাওয়া যায়। দুপুরের খাবার খেয়ে বিকেলের ট্রেনে উঠে পড়ি আমরা। আমরা ঢাকার পথে যাত্রা শুরু করি। এভাবেই আমাদের যাত্রা শেষ হয়। এবার অপেক্ষার শুরু মেঘ আর পাহাড়ের দেশে আবার কবে সৌন্দর্য পান করতে যাবো? নির্মল প্রকৃতি আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে ডাকে সাড়া না দিয়ে কি পারা যায়?

গোধুলির আলোয় যাত্রাপথের এক নৈশর্গিক দৃশ্য

মৃত্যুঞ্জয়ী এ বি এম মুসা

সাহসী সাংবাদিকতার প্রতিচ্ছবি

সামিউল ইসলাম শোভন

'মুসা ভাই' - সাংবাদিক মহলে তিনি এ নামেই পরিচিত। স্বাধীন বাংলাদেশের সাংবাদিকতার অন্যতম পথিকৃৎ বলা হয়ে থাকে তাকে। তিনি ছিলেন একাধারে সাংবাদিক, সম্পাদক ও কলামিস্ট ও প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ৬০ বছরের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে দেশকে দিয়েছেন অনেক কিছুই। এদেশের সাধারণ মানুষের অধিকার নিয়ে তার ক্ষুরধার লেখনী বার বার কথা বলেছে।

এবিএম মুসার পুরো নাম আবুল বাশার মোহাম্মদ মুসা। জন্ম ১৯৩১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলার ধর্মপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। বাবা ছিলেন তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ছোটবেলা থেকেই লেখালেখির প্রতি তার আগ্রহ ছিল।

এবিএম মুসার প্রথম লেখালেখির অভ্যাস গড়ে উঠে সাপ্তাহিক 'কৈফিয়াত' পত্রিকার মাধ্যমে। তবে তিনি প্রত্যক্ষভাবে সাংবাদিকতা শুরু করেন ১৯৫০ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে 'দৈনিক ইনসাফ' এর মাধ্যমে। ওই বছরেই আবার তৎকালীন 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকায় কাজ শুরু করেন। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি অবজারভারে রিপোর্টার, স্পোর্টস রিপোর্টার এবং বার্তা সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন।

সাংবাদিকতার পথিকৃত প্রয়াত এবিএম মুসা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্নেহভাজন এবিএম মুসা মুক্তিযুদ্ধেও বড় অবদান রেখেছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি বাংলাদেশের পক্ষে 'বিবিসি', 'সানডে টাইমস' ইত্যাদি আন্তর্জাতিক পত্রিকাতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরাসরি সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেন।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে তিনি 'সানডে টাইমস' পত্রিকার রিসার্চ ফেলো নির্বাচিত হন। এছাড়া এবিএম মুসা 'মর্নিং নিউজ'-এর সম্পাদক এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাব্যবস্থাপক হিসেবেও কাজ করেন। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক এবং ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার মহাব্যবস্থাপক ও প্রধান সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া ২০০৪ সালের দিকে কিছুদিন 'দৈনিক যুগান্তর'-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তবে বিভিন্ন টেলিভিশনের টক শো অনুষ্ঠানে তার আলোচনা ও সংবাদ বিশ্লেষণ তুমুল দর্শকপ্রিয় ছিল।

রাজনীতি কখনোই তার আগ্রহের বিষয় ছিল না। পাকিস্তান আমলে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তাকে বলা হলে তিনি বলেছিলেন-যদি কোনোদিন দেশ স্বাধীন হয়, তবেই নির্বাচনে দাঁড়াব। পরে তিনি কথা রেখেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের আহ্বানে

পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

সাক্ষাৎকার

আসাদ চৌধুরীর অন্দরমহল

এ দেশের শিল্প সাহিত্য জগতের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব কবি আসাদ চৌধুরী। সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই তাঁর অবাধ বিচরণ। কবিতায় আত্মমগ্ন আসাদ চৌধুরী শিশুসাহিত্যে যোগ করেছেন ভিন্ন এক মাত্রা। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও বঙ্গবন্ধুর জীবনী লেখাতেও রেখেছেন অগ্রণী ভূমিকা। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজ করে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন রেখেছেন বিশেষ অবদান। কর্মজীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন বাংলা একাডেমিতে। পেয়েছেন 'একুশে পদক'। গুণী এই মানুষটির সঙ্গে কথা বলেছেন দ্য ইউল্যাবিয়ান সম্পাদক এ এস এম রিয়াদ আরিফ

ইউল্যাবিয়ান: পঞ্চাশ বছর ধরে কবিতার সঙ্গে বাস–কিভাবে দেখেন বিষয়টা?

আসাদ চৌধুরী : কবিতার মধ্য দিয়ে নিজেকে টুকরো টুকরো করে জানা যায়। আমার কাছে কবিতা এক ধরনের শক্তি। তাই কিছু বছর হলো কবিতা নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে পেরেছি বলে ভালোই লাগে। কবিতা লিখে বা পড়ে নিজেকে জানার চেষ্টা করি। এক ধরনের আত্ম-অনুসন্ধান বলা যায় ব্যাপারটাকে। আমি কবিতার গন্ধ শুঁকি, কবিতার চাষাবাদ করি। তবে নিজেকে কবি ভাবার চাইতে কবিতার একনিষ্ঠ পাঠক ভাবতেই পছন্দ করি।

ইউল্যাবিয়ান : কবিতার নির্মাণে যেহেতু শ্রম জড়িত আছে, তাই আপনাকে যদি একজন কবিতা শ্রমিক বলি!

আসাদ চৌধুরী : হ্যাঁ। সেটা বলা যায়। তবে শ্রম ব্যাপারটার একটা আলাদা গুরুত্ব আছে। সভ্যতার পেছনে শ্রম, জীবনের পেছনে শ্রম, আমরা যে ভালোভাবে বেঁচে আছি কিংবা বাঁচার চেষ্টা করছি– তার পেছনে শ্রম। সমাজ কোনোদিনই টিকতো না, যদি শ্রম না থাকতো। আর কবি মানেই তো শ্রমিক। কবি মানেই নির্মাতা। কবিরা সমাজ কাঠামো নির্মাণ করেন, স্বপ্ন নির্মাণ করেন, কবিতার শরীর নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। পুরো ঘটনাই একটা জটিল শ্রমসাধ্য ব্যাপার।

ইউল্যাবিয়ান : কবিদের দায়বদ্ধতাটা তাহলে কার কাছে?

আসাদ চৌধুরী : কবি তো সমাজের সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশ। কবিতা প্রতিবাদের একটা জোরালো প্ল্যাটফর্ম। কবিরা তাই সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল গোষ্ঠী। সমাজের অনুভূতি, মানুষের অনুভূতি সবই একজন কবি ধারণ করেন।

ইউল্যাবিয়ান : সায়েন্স-টেকনোলজি আর কম্পিউটারের এই যুগে সাহিত্যের অবস্থান কতখানি মজবুত?

আসাদ চৌধুরী : সাহিত্যের আসলে স্থানচ্যুত কিংবা স্ব-ধর্মচ্যুত হবার আপাতত কোনো আশঙ্কা নেই। পৃথিবীতে মানুষের যতদিন স্বপ্ন থাকবে, ভয় থাকবে ততদিন সাহিত্য থাকবে। যেদিন সবকিছু অনুভূতিহীন হবে, ভোঁতা হয়ে যাবে সেদিনই কেবল সাহিত্যের বিলুপ্তির প্রসঙ্গ আসতে পারে।

ইউল্যাবিয়ান : আমরা কি ধীরে ধীরে খানিকটা অনুভূতিহীন হয়ে যাচ্ছি না? আপনিই তো একটা জায়গায় বলেছেন 'তখন সত্যি মানুষ ছিলাম, এখন আছি অল্প'।

আসাদ চৌধুরী : আসলে ৭১'এর আগেই আমরা মানুষ ছিলাম। এখন অনেক ছোট হয়ে গেছি। তবে সমাজে এখনও অনেকেই আছেন যারা এই আন্তর্জাতিকবাদ আর বিশ্বায়নের যুগে নিজেকে বিশুদ্ধ রেখেছেন। ৭৫'এর পর থেকেই আমাদের রাষ্ট্রকাঠামোর যে অধঃপতন সেখান থেকেই আমাদের লোভ, হিংসা এসব প্রকট হয়েছে। আমাদের একটা সুন্দর সমাজ ছিল। যেখানে সবাই সবাইকে চেনার চেষ্টা করতো। গাছের ডাব, মাচা ভর্তি আম একজন আরেকজনকে দিত। এসব আমরা দেখে এসেছি।

ইউল্যাবিয়ান : এবার আপনার শৈশবে ফিরতে চাই।

আসাদ চৌধুরী : আমার জন্ম বরিশালে হলেও শৈশবের অনেকটাই কেটেছে ঢাকায়। ঢাকা তখন কেবল একটা জন-নগরীতে পরিণত হচ্ছে। সেই ১৯৪৭। আমরা বুড়িগঙ্গায় গামছা দিয়ে মাছ ধরতাম। সদরঘাটে আমরা বেশ কয়েকদিন নৌকাতেই কাটিয়েছি।

ইউল্যাবিয়ান : সেই ঢাকা আর এই ঢাকার ব্যবধানটা কিভাবে দেখেন?

আসাদ চৌধুরী : পার্থক্য বোধহয় দুই সময়ের মানুষগুলোর মধ্যে। নগর নগরের জায়গাতেই আছে। কেবল আগের মানুষগুলো তাদের মতো করে নগরটাকে গড়তে চেয়েছিল। আর এখনকার তোমরা তোমাদের মতো করে গড়তে চাও। একেক যুগের মানুষ একেক রকম। এখন মানুষ শুধু ছুটছে আর ছুটছে। টাকার জন্য ছুটছে, খ্যাতির জন্যে ছুটছে। আমরা সিনেমায় যেতাম, পার্কে বাদাম চিবোতাম; এখনকার তরুণেরা কম্পিউটারে সেই সময় দিচ্ছে, নানান কিছু ব্রাউজ করছে।

ইউল্যাবিয়ান : আপনার শিক্ষা জীবন বিষয়ে...

আসাদ চৌধুরী : আমি মোটেও ভালো ছাত্রদের তালিকায় ছিলাম না। ব্রজমোহন কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ভর্তি হই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। সেখানে সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলাম আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আব্দুল মান্নান সৈয়দের মতো মেধাবী সাহিত্যিকদের। এটা আমার অনেক বড় পাওয়া।

ইউল্যাবিয়ান: আপনার বর্ণাঢ্য কর্মজীবন নিয়ে যদি বলতেন...

আসাদ চৌধুরী : আমার সৌভাগ্য যে আমি বাংলা একাডেমির মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। সেখানে নীলিমা আপার (ড. নীলিমা ইব্রাহিম) সান্নিধ্য পেয়েছি। কয়েক বছর জার্মান বেতারে কাজ করেছি, বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি দৈনিকে কাজ করেছি। এমনকি শিক্ষকতাও করেছি।

ইউল্যাবিয়ান : শিশু সাহিত্যের প্রতি আপনার বাড়তি মনোযোগ কেন?

আসাদ চৌধুরী : শিশুদের আমার প্রচণ্ড ভালো লাগে। ওদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটালে নিজের বয়সটা খানিকটা কমে যায়। জীবনের শেষ লেখাটাও আমি শিশুদের জন্যে লিখতে চাই।

ইউল্যাবিয়ান : যদি জিজ্ঞেস করি কেন লেখেন? আপনার কাছে ব্যাখ্যাটা কেমন হবে?

আসাদ চৌধুরী : প্রতিদিন মানুষের সঙ্গে মিশছি, ঘুরছি, ফিরছি। নিজেকে ধীরে ধীরে জানছি। যতোই বয়স বাড়ছে নিজের অভিজ্ঞতার ঝুলি বাড়ছে। সে সব তো আর আমার একার মধ্যে জমিয়ে রাখতে পারি না, তাই নিজেকে খানিকটা হালকা করার জন্য লিখি। গল্প বলার একটা আকাঙ্খা আমাকে তাড়া করে।

ইউল্যাবিয়ান : জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসেবটা মেলাতে গিয়েছেন কখনও?

আসাদ চৌধুরী : আমার জীবনের সবটাই প্রাপ্তি। এই যে হাসছি, ঘুরছি, প্রকৃতির সান্নিধ্য পাচ্ছি, মানুষের কাছে আসতে পারছি। এসবই তো প্রাপ্তি। তবে আলাদা করে বলতে গেলে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি আমি স্বাধীন বাংলা বেতারে কাজ করতে পেরেছি। আমার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও আমি বঙ্গবন্ধুর জীবনী লিখেছি। সবই আনন্দের, সবই প্রাপ্তির। আমার জীবনে কোনো অপ্রাপ্তি নেই।

ইউল্যাবিয়ান: তরুণদের নিয়ে আপনার প্রত্যাশা ...

আসাদ চৌধুরী : আমার কাছে নেক্সট জেনারেশনটা খুব ইম্পরট্যান্ট। ওরা একদিন দেশকে জানবে, বুঝবে। আমার বিশ্বাস ওরা একদিন হাল ধরবে। তাই ওদের বেড়ে ওঠাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

চলচ্চিত্র পর্যালোচনা

জলসাঘর

এ এস এম রিয়াদ আরিফ

মহিম গাঙ্গুলির ইট বোঝাই লরি ধূলোর স্রোতে আড়াল করে দিয়ে গেলো এক সময়ের প্রতাপশালী জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের ঘোড়াকে, যে ঘোড়া এক সময় দুর্দান্ত গতিতে ছুটতো, দাপিয়ে বেড়াতো।

লরি কি শুধু ঘোড়াকেই ঢেকে দিয়ে গেল?

সত্যজিৎ রায়ের এই ছোট্ট শটের বিষয়বস্তু শুধু ঘোড়া আর লরির মধ্যেই রাখা যেত। কিন্তু আমরা তা রাখতে চাই না।

ছোট এই দৃশ্যই যেন আভাস দিচ্ছে নতুন এক যুগের। যে যুগের নাম যন্ত্র যুগ। যে সভ্যতার নাম যান্ত্রিক সভ্যতা। গ্রামের ধূলোমাখা পথে সর্বনাশা যন্ত্র সভ্যতার করাল থাবা।

তারাশঙ্করের উপন্যাস থেকে নির্মিত 'জলসাঘর' নিঃসন্দেহে সত্যজিৎ রায়ের সেরা কাজগুলোর একটি। সেই সঙ্গে বাণিজ্যিকভাবেও যথেষ্ট সফল।

ছবির পুরো কাহিনীই আবর্তিত হয়েছে নখদর্পণহীন জমিদার বিশ্বম্ভর বাবুর বিধ্বস্ত পতনের গল্পকে ঘিরে। জমিদার বেঁচে আছেন কিন্তু জমিদারি আর নেই। তবুও প্রচণ্ড দাম্ভিক বিশ্বম্ভর রায় চূর্ণ হবেন না। বংশ আভিজাত্যের দম্ভকে টিকিয়ে রাখতে তাই তিনি বিসর্জনের নেশায় মেতেছেন। পুরো ছবিতেই নির্মাতা এই জমিদারের প্রতি একটু বেশিই মানবিক। সঙ্গীতের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা তাকে একজন শিল্প অনুরাগী মানুষ হিসেবেই চিনিয়েছে। তাই দর্শকের চোখে তাঁর দম্ভ খুব একটা ধরা পড়ে না, যেটা পড়ে সেটা হলো তাঁর আত্মমর্যাদা বোধ। তবে এই বোধের সীমা লঙ্ঘন তাঁর জন্য ডেকে আনে ভয়ঙ্কর পরিণতি। একজন দাম্ভিক জমিদারকে মানবিক মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারার মাঝেই নির্মাতার সার্থকতা। এখানেই সত্যজিৎ রায় কালজয়ী। তাই বিশ্বম্ভর বাবুর করুণ পরিণতিতে একজন মনোযোগী দর্শক হিসেবে আমাদের কাঁদতে হয়, তার প্রতি পরম সহানুভূতির দরজা খুলে দিতে হয়।

জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের ভূমিকায় ছিলেন ছবি বিশ্বাস। পরিচালকের বয়ানে "ছবি বাবুর মতো অভিনেতা না থাকলে 'জলসাঘর'কে চিত্রনাট্যে রূপ দেওয়া সম্ভব হতো না।"

তবে ছবির লোকেশন অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের যে জমিদার বাড়িতে শ্যুটিং হয়েছে সেটি বড্ড বেশিই নির্জন মনে হতে পারে। বিশ্বম্ভর বাবু ঠিক কোন এলাকার জমিদার সেটি বোঝার উপায় নেই। হয়তো পরিচালক চেয়েছিলেন জমিদারের জমিদারিকে প্রধান্য না দিয়ে বরং জমিদারের মন বিশ্লেষণ করতে। তবে সেই নব্য শহুরে ধাঁচে গড়া মহিম গাঙ্গুলির বাড়িখানা দেখার আকুতি শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়।

ছবির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক জমিদারিহীন জমিদারের প্রতি ভৃত্যদের অন্ধ আনুগত্য, যা তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ছবিতে নিখাদ বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আমেজ দর্শককে অন্য এক জগতে পৌঁছে দিতে পারে অনায়াসেই। ওস্তাদ বেলায়েত খাঁর সঙ্গীত পরিচালনাকে বেশ পরিমিত ও পরিশীলিত বলা যায়। আর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি সত্যজিৎ রায় বরাবরই বেশ দুর্বল। সব মিলিয়ে অভিনয় নৈপুণ্য, চিত্রনাট্য, সংলাপ আর তৎকালীন সমাজ বাস্তবতা সবকিছুর ভিতর দিয়ে জলসাঘর সত্যিই কালের সীমানাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। তাই সত্যজিৎ রায়ের জলসাঘর আমাদের সবার জলসাঘর হয়ে উঠতে পেরেছে।

পুস্তক সমালোচনা

বড়ই নিঃসঙ্গতা

সানজিদা হক

বড়ই নিঃসঙ্গতা। উপন্যাসটি হাতে নিয়ে প্রচ্ছদ দেখলেই মনে একরাশ হতাশা, একাকীত্ব ও বাস্তব জীবনের কিছু অন্ধকার বিষাদের ছায়া মনের মধ্যে উঁকি দেয়। তবে পাঠক একবার বইটি পড়তে শুরু করলে ক্রমান্বয়ে দেখতে পাবে একালের দিশাহারা বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তিসত্তার জীবনকথা যা আমাদের শত টানাপড়েনময় সমাজের শিল্পিত দলিল। একটি সহজ সাবলীল ভাষায় উপন্যাস দিয়ে কিভাবে খুব সহজেই মানবজীবনের অন্তরালে প্রবেশ ও যন্ত্রণাকাতর মনের অতলে নাড়া দেওয়া যায় তা তিনি দেখিয়েছেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শরিফ সাহেব। যে তার কাজের বদলে কখনোই ফেরত পায়নি প্রাপ্য সম্মান। জীবনের প্রতিটি স্তরে তাঁকে দেখতে হয়েছে আধুনিক সমাজের নোংরা কিছু বাস্তবতা। সে অবিবাহিত বলে বেশিরভাগ সময় অফিসের লেট নাইট পার্টিতে তার জায়গা হয় না, বাড়িওয়ালা তাকে সুযোগ পেলেই নানা কটুক্তি শোনায়। কিন্তু তবুও শরিফ সাহেব হাল ছাড়েননি। জীবনে ভগ্ন মনোরথ হবার মতো অনেক কিছু ঘটলেও সবসময় ছিলেন কঠোর। অফিসের আধুনিকতার নামে সহজলভ্য নারীর কাম-বাসনা কোনদিনও তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তবে পরবর্তীতে কাহিনীর বিন্যাসে দেখা যায়, কলিযুগের অভিশপ্ত সমাজের প্রতারণার জালে আটকে যায় শরিফ সাহেব। দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের চাপে পদদলিত হয় শরিফ সাহেব এর সততা, একনিষ্ঠতা ও কাজের প্রতি একাগ্রতা। লেখকের ভাষায় "দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের খাতির বেশি কারণ তাদের গাড়ি থাকে, তাদের ছেলেমেয়েরা অভিজাত স্কুল কলেজে, বিলেত-আমেরিকায় শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। আর একই পদের সৎ লোকেরা সেসব কিছু নেই বলে সহ্য করে লোকজনের উপেক্ষা।"

উপন্যাসটিতে নারী-পুরুষের শারীরিক সম্পর্কের ওপরে স্থান লাভ করেছে আত্মিক সম্পর্ক। আমাদের সমাজে এমন অনেক সম্পর্ক আছে যা রক্তের নয় আত্মার, কিন্তু সমাজের চোখে সেসব সম্পর্ক নষ্ট। লেখক এখানে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন এই আত্মার সম্পর্ক কি এবং তা কতটা পবিত্র।

উপন্যাসটিতে নারী চরিত্রের অভাব না থাকলেও শেষে এক উন্মাদিনীর সঙ্গে মিলন ঘটে শরিফ সাহেবের, তাও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

রশিদ করিম অত্যন্ত সুন্দরভাবে সহজ সাবলীল ভাষায় আঘাত করেছেন সমাজের কলুষতার ওপর। পাঠক মনে দাগ কাটার মতো তৈরি করেছেন কিছু শক্তিশালী চরিত্র যা উপস্থাপন করে মধ্যবিত্ত সমাজের আমাকে, আপনাকে, আমাদের। এই উপন্যাসটির সার্থকতা হলো এখানে লেখক অতি সুন্দরভাবে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক পজিশন-এর মাঝে। যেখানে মানবতা বিলুপ্ত হয়, তবে মৃত্যুর মাঝে আবার জন্ম নেয় এক রাশ নতুন স্বপ্নের। এভাবেই চলে আমাদের জীবন।

এ বি এম মুসা

পৃষ্ঠা ৮ এর পর

সাড়া দিয়ে তিনি ১৯৭৩-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ফেনী থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের একজন সদস্য নির্বাচিত হন। তবে ৭৫'এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর তিনি আর রাজনীতিতে ফিরে আসেননি।

সাংবাদিকতা ছাড়াও তিনি জাতিসংঘের হয়ে কাজ করেছেন। ১৯৭৮ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ কার্যক্রমের (এসকাপ) এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক পদে যোগ দেন।

স্বাধীন বাংলার এই কিংবদন্তিতুল্য সাংবাদিক জাতীয় প্রেসক্লাবের চারবার সভাপতি ও তিনবার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়া বাংলাদেশের অন্যতম সম্মানজনক পুরস্কার 'একুশে পদক' অর্জন করেন।

২০১২ সালে এবিএম মুসা 'মুজিব ভাই' নামে একটি বই রচনা করেন, যেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া মৃত্যুর কয়েক বছর আগে থেকে আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন তিনি। যদিও তা মৃত্যুর আগে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমন কোনো বিষয় নেই যেখানে তার কলম কথা বলেনি। অধিকার নিয়ে তিনি লিখে গেছেন জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত।

নিজের কলমের শক্তিতে সবাইকে হারিয়ে দিলেও জীবন যুদ্ধে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লড়তে তিনি হেরে গেলেন। ২০০০ সাল থেকেই ভুগছিলেন বিভিন্ন বার্ধক্যজনিত রোগে। এরপর ২০০৩ সালের দিকে মাইলোডিসপ্লাস্টিক সিনড্রোমে আক্রান্ত হন। এই প্রাণঘাতী রোগ লাখো ভক্তকে কাঁদিয়ে ২০১৪ সালের ৯ এপ্রিল দুপুর সোয়া একটার দিকে তাকে না ফেরার দেশে নিয়ে চলে যায়। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

একজন এবিএম মুসা শুধু সাংবাদিক হিসেবেই নয়, এদেশের একজন সুনাগরিক হিসেবে তার কলমের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন এই দেশের সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। তিনি না থাকলেও তার রেখে যাওয়া কর্মের মাঝে বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল।

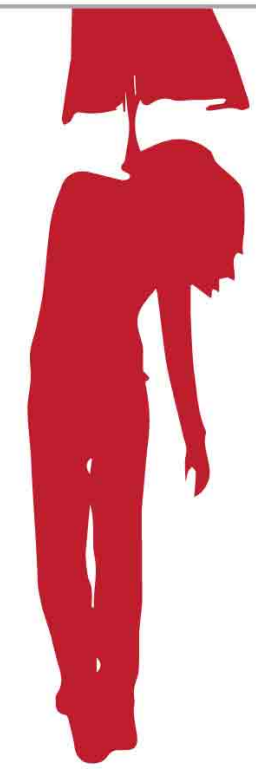

স্বপ্ন

শোভন সামিউল

১.

গভীর রাত। ঠিক করে বলতে পারছি না কয়টা বাজে। কারণ হাতে ঘড়িটা নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যখন চোখ সয়ে এলো, আবছাভাবে দেখতে পেলাম আমার দুই পাশে সারি সারি লাশ। আমি চমকে উঠলাম! আচ্ছা আমি এখানে কেন? আমি কি মারা গেছি? মারা না গেলে আমি এখানে লাশের পাশে শুয়ে কেন?

অন্য সময় আমার পাশে এত লাশ দেখলে খুব ভয় পেতাম। কিন্তু কী এক অস্বাভাবিক কারণে এখন আমার ভয় লাগছে না! কী কারণে ভয় লাগছে না এটাও একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার! মাথা থেকে একটা প্রশ্ন কোনোভাবেই সরাতে পারছি না। মস্তিষ্কের একটা দিক শুধু একই কথা জানতে চাচ্ছে আমি এখানে কেন? আসলে মাথার এই দিকটা কেন জানি অপ্রয়োজনীয় টাইপ। শুধু প্রশ্ন করে, কিন্তু উত্তর বের করতে পারে না। আচ্ছা সত্যিই তো, আমি এখানে কেন! আমি কি মারা গেছি? কী হয়েছিল আমার?

নিজের কাছে নিজের প্রশ্নগুলোর উত্তর পেলাম না বলে খুব মেজাজ খারাপ লাগছে।

এই বদ্ধ ঘরে আর থাকতে পারছি না। পাশের লাশগুলোর দিকে কেমন জানি শরীর গুলিয়ে উঠছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। নিজের জায়গা থেকে উঠে দরজার উদ্দেশ্যে এগোলাম। খেয়াল করলাম ঘরটাতে একটা মাত্র জানালা আর একটা মাত্র দরজা ছাড়া কিছু নেই। আমার কেমন জানি সন্দেহ হল। আচ্ছা জায়গাটাকে অনেকটা মর্গের মত মনে হচ্ছে না? বুকের ভেতর বড় ধরনের ধাক্কা খেলাম। আমার সন্দেহ যদি সত্যি হয়, তার মানে দাঁড়াচ্ছে আমি মারা গেছি! নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছে। ছুটে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে, খেয়াল করলাম দরজা খোলা লাগলো না। কী এক অদৃশ্য শক্তির ওপর ভর করে বন্ধ দরজার ভিতর দিয়ে দরজা না খুলেই বের হয়ে আসলাম! কী ভুতুড়ে কাণ্ডরে বাবা! এবার ভালো করে চারিদিক লক্ষ্য করলাম। ঘরটার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। উপরে বড় বড় করে লেখা 'মর্গ হাউস'! বুঝলাম আমি মারা গেছি। হঠাৎ নিজেকে কেন জানি অনেক একা মনে হতে লাগলো।

২.

আমি আরিফ। মো. আরিফ হাসান। ছোট একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করি। বৃদ্ধা মা, স্ত্রী চন্দ্রশিলা আর দেড় বছর বয়সী একমাত্র কন্যা রাকাকে নিয়ে আমার ছাপোষা সংসার। যান্ত্রিক এই ঢাকা শহরের কোনো এক মধ্যবিত্ত (!) এলাকায় একটা ছোট্ট ভাড়া বাসায় আমার ও আমার পরিবারের দিন বেশ ভালোভাবেই কেটে যাচ্ছে।

কোনো এক কর্মব্যস্ত দিনের সকাল। অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নাস্তার টেবিলে বসেছি। এক পর্যায়ে স্ত্রী চন্দ্রশিলা জানালো, মেয়ের দুধ নাকি ফুরিয়ে গেছে। এখন না আনলে দুপুরে খাওয়া হবে না। কী ভয়ানক কথা! মেয়ের খাওয়া হবে না? আমি তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে গেলাম দোকানের উদ্দেশে। কারণ অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি বাসা থেকে নেমে দ্রুত হাঁটা শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতে চিন্তা করা আমার এক ধরনের বদ অভ্যাস বলা যায়। আসলে চিন্তা আসবেই না বা কেন? মধ্যবিত্ত সংসারের কর্তাদের মাথায় স্বাভাবিকভাবেই সবসময় চিন্তা থাকে। জীবনের চিন্তা, বাস্তবতার চিন্তা, এতটুকু সুখী হওয়ার চিন্তা। মাত্র অল্প কয়টা টাকার বেতনে অনেক কষ্ট করে সংসার চালাতে হয় আমাকে। আর এ যুগে বাচ্চাদের খাবারের যা দাম, তাতে বড়দের না খেয়ে থাকা ছাড়া উপায় থাকবে না আর কিছুদিন পর। কিন্তু ওসব ভেবে লাভ নেই, কারণ আমার মেয়েই এখন আমার স্বপ্ন, আমার সব। কষ্ট হলেও আমি তার জন্য আমার সাধ্যমতো করতে চাই।

এসব হাবিজাবি চিন্তা করতে করতে কখন যে দোকানের সামনে চলে এসেছি বুঝতেই পারিনি। যাই হোক, অত ভেবে লাভ নেই। কপালে যা আছে তাই হবে।

মেয়ের জিনিসগুলো কিনে ফিরতি পথ ধরলাম। বেশি সময় নেই, অফিসে যেতে হবে। চন্দ্রশিলার ওপর হঠাৎ করে কেন জানি বিরক্ত লাগা শুরু হল। মেয়েটা যে কী! কাজের কথা কখনোই আগে বলতে পারে না। শুধু তাড়াহুড়োর সময় ঝামেলা করে। বাসায় চলে এসেছি প্রায়। মোড়ের বড় রাস্তাটা পার হলেই পথ শেষ। রাস্তা পার হচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ করে পাশ থেকে একটা কালো রঙের গাড়ি এসে আমার গায়ে উঠে গেল। এরপর শুধু টের পেলাম চারিদিকে হই চই, গাড়ি ভাঙার আওয়াজ। আবছাভাবে দেখতে পেলাম বেশ খানিকটা জায়গাজুড়ে থক থক করছে আমার রক্ত। আমাকে কিছু মানুষ তুলে নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। তারপর সব অন্ধকার।

৩.

আস্তে আস্তে আমার সব মনে পড়তে লাগলো। মায়ের কথা, মেয়ের কথা, স্ত্রীর কথা। মেয়ের কথা! আমার মেয়ের কথা মনে হতেই বুকটা ব্যাথায় ভরে উঠলো। কে জানে মেয়েটা এখনও না খেয়ে আছে কিনা। আর দাঁড়াতে পারলাম না। সোজা ছুটে গেলাম বাসার দিকে। নিজেকে কেমন জানি হালকা হালকা লাগছে। মনে হচ্ছে যেন বাতাসে ভাসছি। নিজের ঘরের সামনে গিয়ে শুনতে পেলাম ভিতরে অনেক মানুষের কথা বলার আওয়াজ। যেহেতু আমার দরজা খোলার প্রয়োজন নেই কারণ আমি এমনিতেই ঢুকতে বা বের হতে পারছি। আমার তখনো জানা ছিল না ঘরের ভিতর আমার জন্য আরেক বিস্ময় অপেক্ষা করছে। ভেতরে গিয়ে দেখলাম আশেপাশের ফ্ল্যাটের সবাই আমার বাসায় উপস্থিত। আমার মায়ের কান্না থামছে না। তাকে সবাই থামানোর চেষ্টা করছে। আমি মায়ের কাছে গেলাম। মাকে বললাম, মা আমি তো আছি, তুমি কেন কাঁদছ? আমিতো যাইনি! কিন্তু আমার মা আমাকে শুনতে পেল না! আমি আম্মার গায়ে হাত দিয়ে বারবার ডাক দিলাম কিন্তু আমার স্পর্শ আমার মা পেল না। আমি চিৎকার করে উঠলাম। কিন্তু হায়! আমার কোনো কিছুই সে টের পেলো না। আমি সামনে থাকা সবার কাছে গেলাম তাদেরকে ডাকলাম তারাও আমার কথা শুনতে পেল না; দেখা তো দূরে থাক। আমার খুব অসহায় লাগছিল। ভেবে পাচ্ছিলাম না কী করব। চোখ ফেটে কান্না আসছে, কিন্তু সেই কান্না এখন অর্থহীন।

আচ্ছা আমার স্ত্রী আর মেয়ে কই? তাদেরকে দেখছি না কেন? খেয়াল করলাম আমার শোবার ঘরটা ভেতর থেকে বন্ধ। আমি অদৃশ্যভাবে ভেতরে গিয়ে দেখি আমার বাচ্চা মেয়েটা বিছানায় ঘুমাচ্ছে আর স্ত্রী ঘরের এক কোণে বসে নিজের হাঁটুতে মাথা গুঁজে কাঁদছে। খুব কষ্ট লাগলো মেয়েটার জন্য। এই মেয়েটা সেই শুরু থেকেই আমার পাশে আছে। অনেক কষ্ট করেছে আমার জন্য। কিন্তু আমি তার জন্য কিছুই করতে পারিনি। এখন আমি কী বলব তাকে? তাকে কিভাবে জানাবো আমি তার পাশেই আছি? আমার কথা তো সে শুনতেও পারবে না। আমাকে দেখতেও পারছে না। আমি আর কিছু ভাবতে পারলাম না। খুব কষ্ট হচ্ছে আমার। ঘরের বাইরে মা, ভিতরে স্ত্রী সবকিছু আমি দেখছি, বুঝছি কিন্তু আমাকে কেউ দেখছে না। আমার মেয়েটা এখন পর্যন্ত খেয়েছে কিনা খুব জানতে ইচ্ছা করছে। হয়তো আমার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর থেকে কেউই খায়নি। ওর নিষ্পাপ ঘুমন্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে নিজেকে একই সঙ্গে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী ও অসুখী মনে হতে লাগলো। সুখী এজন্য যে আমি ওর বাবা। কিন্তু 'ছিলাম'। এখন মারা গেছি। আর কোনোদিন আমার রাকাকে আদর করতে পারবো না। আর কোনোদিন কোলে নিতেও পারবো না। জানি না শেষ পর্যন্ত কী হবে এই পরিবারটার।

হঠাৎ খেয়াল করলাম চন্দ্রশিলা মাথা তুলে চোখ মুছলো। তারপর বিছানায় উঠে দাঁড়ালো। আমি সব কিছু দেখছি। তারপর দেখলাম ও ওর ওড়নাটা নিয়ে সিলিং ফ্যানের সাথে বাঁধা শুরু করলো। আমি আতঙ্কে জমে গেলাম। ও আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে! একি করছে ও! আমি ওকে থামাতে গেলাম। কিন্তু তখনই মনে পড়লো আমি ওকে থামাতে পারবো না । কারণ আমি যে অদৃশ্য! আমি তখন অসহায়, কী করব বুঝতে পারছি না। তাহলে কি চেয়ে চেয়ে ওর তিলে তিলে মারা যাওয়ার দৃশ্য আমাকে সরাসরি অবলোকন করতে হবে? এতো বড় শাস্তি আমার জন্য অপেক্ষা করছিল আমি কখনো ভাবিনি। আমি এ ঘর থেকে ও ঘর পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগলাম। কিন্তু কিসের কী, কেউ টের পেল না। চেয়ে চেয়ে দেখলাম আমার স্ত্রী ফ্যানের সঙ্গে নিজেকে ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করলো, বাচ্চাটার কথা ভাবলো না। আমার মেয়েটা যেন পৃথিবীর সবটুকু সুখ নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। ঠিক তার একটু আগে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করা মায়ের মতো।

৪.

এই ওঠো! ওঠোওওওও.! আর কত ঘুমাবা? অফিসের সময় হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি ওঠো। নাহলে কিন্তু মাথায় পানি ঢেলে দেব। হুড়মুড় করে উঠে বসলাম। চোখেমুখে রাজ্যের বিস্ময়। দেখি চন্দ্রশীলা কোমরে হাত দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, পাশে আমার মেয়ে রাকা খেলা করছে। তাহলে কি সবকিছু স্বপ্ন ছিল! না না দুঃস্বপ্ন ছিল!! মনটা আনন্দে ভরে উঠলো। ফিরে পাওয়ার আনন্দে। এই আনন্দ কাউকে বোঝানোর নয়।

কতক্ষণ বোকার মতো স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে এসব ভাবছিলাম মনে নেই। চিন্তায় বাধা পড়লো তার ডাকে। 'কী সমস্যা তোমার? এতক্ষণ মরার মতোন ঘুমিয়ে এখন আবার গাধার মতো তাকিয়ে আছ কেন?' আমি উত্তর দিলাম; না কিছু না। স্ত্রী বলল, 'যাও ফ্রেশ হয়ে নাও। অফিসের সময় হয়ে গেছে, নাস্তার টেবিলে আস।' তৈরি হয়ে এসে দেখলাম টেবিলে মা আর স্ত্রী অপেক্ষা করছে। নাস্তা করার এক পর্যায়ে স্ত্রী জানালো মেয়ের দুধ প্রায় শেষ এখন না আনলে দুপুরে খাওয়া হবে না। নাস্তা করে যেন একটু দুধটা এনে দিয়ে তারপর অফিসে যাই। কথাগুলো শুনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। কারণ স্বপ্নের মত বাস্তবেও একই ব্যাপার ঘটছে। তাহলে কি সপ্ন সত্যি হতে যাচ্ছে?

ছবির গল্প

অরণ্য

বাংলাদেশ, আমাদের রূপসী বাংলা! এখানে প্রকৃতি উদার, কোমল ও সবুজ। সীমাহীন আকাশ, ঝর্ণার স্বচ্ছ কোমল জল কিংবা নির্মল প্রকৃতি মানুষকে মুগ্ধ করেছে বারবার। স্নিগ্ধতা আর শুদ্ধতার ছোঁয়া পেতে মানুষও ছুটে গেছে আকাশ, নদী আর ঝর্ণার কাছে। মানুষতো প্রকৃতির-ই সন্তান! তাই মানুষ নিত্য ছুটে যায় অরণ্যে।

ছবি: সুমিত্র সুজন
গল্প: রিয়াদ আরিফ